১৯৬০ সালে কে এম মুন্সি সংসদে প্রথম সরকারি দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য লোকপাল ধরনের একটি সংস্থা দাবি করেন। ১৯৬২ সালে ভারতের তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল এম সি সেতলবাদ আবার লিখিত আকারে এই দাবি তোলেন। পরে তাঁকে সমর্থন করেন সুপ্রিম কোর্টের সেই সময়ের প্রধান বিচারপতি (১৯৬৩)। তার পর একটানা ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৬ সালে বহু নেতা এবং বিশিষ্ট মানুষ এই দাবিতে সরব হয়েছেন। অবশেষে ১৯৬৬ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত গঠনের সুপারিশ করেন।

অর্থ এবং উৎসলোকপাল বিচারবিভাগীয় মর্যাদাসম্পন্ন একটা স্বনির্ভর সংস্থা। সরকারের এবং সরকারি কর্মীদের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অনিয়মের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী এই সংস্থা। এক কথায় মন্ত্রী, সচিব ও আধিকারিকদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জনগণের অভিযোগের প্রতিকার করাই লোকপালের উদ্দেশ্য।

অম্বুডসম্যান বা প্রকিয়োরেটর বা লোকপাল সবই জন-প্রশাসন (পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)-এর বিষয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার অন্যতম মাধ্যম হল জন-প্রশাসন; সহজ কথায় সরকারি প্রশাসন। তত্ত্বগত ভাবে জন-প্রশাসনের অন্যতম দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি হল সহায়ক (ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট), যেখানে নাগরিকবৃন্দ হল প্রশাসনের সুবিধা ভোগকারী, আর অংশগ্রহণকারী (পার্টিসিপেটিভ), যেখানে জনগণই চালিকা শক্তি। দুই দৃষ্টিভঙ্গিতেই জনসাধারণ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। তাই সরকারি প্রশাসন জনগণের চাহিদা ও অভিযোগ উপেক্ষা করতে পারে না। তা ছাড়া মন্ত্রী, আমলা ছাড়া জন-প্রশাসন সম্ভব নয়। আর এখানেই দুর্নীতির আশঙ্কা। অর্থাৎ, জন-প্রশাসন যেমন জনগণের স্বার্থরক্ষার মাধ্যম, তেমনই আবার দুর্নীতির বীজতলা। এই আশঙ্কা থেকেই অম্বুডসম্যান বা লোকপালের জন্ম।

১৯৬০ সালে ভারতে লোকপাল নিয়ে বিতর্কের সূচনা হলেও প্রথম লোকপাল 'বিল' (আইনের

খসড়া) আকারে আনা হয় ১৯৬৮ সালে। এই বিলে লোকপাল ও লোকায়ুক্ত (মূলত রাজ্যের জন্য) স্থাপনের কথা বলা হয়। বিলটি লোকসভায় অনুমোদিত হয়, তার পর যথারীতি রাজ্যসভায় যায়। রাজ্যসভা বিলটির কিছু সংশোধনের প্রস্তাব দেয়। নিয়ম অনুসারে বিলটি আবার লোকসভায় ফেরত আসার কথা এবং লোকসভা সংশোধন গ্রহণ করলে বিলটি সংসদের অনুমোদন পেয়েছে ধরা হয়। কিন্তু, লোকসভায় আলোচনার আগেই হঠাৎ চতুর্থ লোকসভা ভেঙে যায়। ফলে লোকপাল বিল বাতিল হয়ে যায়।

১৯৭১, ’৭৭, ’৮৫, ’৮৯, ’৯০, ’৯৬, ২০০১, ’০৫ এবং ’১০ সালে লোকপাল বিল সংসদে আসে এবং চলে যায়; কাজের কাজ কিছু হয় না।

দশ বারের লোকপাল নিয়ে দু’টি ব্যাপার উল্লেখ্য। প্রথমত, অধিকাংশ বিলই অ-কংগ্রেসি সরকারের আমলে আনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সব বিলেই প্রধানমন্ত্রীকে লোকপালের আওতায় রাখা হয়েছে। কেবল রাজীব গাঁধীর আমলে যে বিল আনা হয়, তাতে প্রধানমন্ত্রীকে প্রথমে বিলের আওতায় রাখা হলেও পরে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, লোকসভার

স্পিকারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকেও লোকপালের আওতা থেকে রেহাই দেওয়া হয়। আর একটা কথা বলা দরকার। অধিকাংশ সময় লোকসভা অসময়ে ভেঙে গিয়েছে, সরকারের পতন ঘটেছে।

শরিক দল ও মন্ত্রিসভার কারও কারও প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ক্যাবিনেটে লোকপাল বিল পাশ করিয়েছিলেন। তার পর ১৯৯৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর লোকসভায় লোকপাল বিল পেশ করেন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। উভয় কক্ষে দীর্ঘ আলোচনার পর মোক্ষম সময়ে সরকারের পতন ঘটে গেল।

বিলটিকে আবার পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে আন্না হাজারের অনশন। লোকপাল বিলের প্রাথমিক খসড়ার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য :

১) প্রস্তাবিত লোকপাল নিজের থেকে কারও বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত (suo-moto) তদন্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না; এ ক্ষেত্রে লোকসভার স্পিকার বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের অনুমতি প্রয়োজন। এমনকী জনগণের অভিযোগও ওঁদের মাধ্যমে আসতে হবে।

২) লোকপাল পরামর্শদাতা সংস্থা, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে শুধু সুপারিশ করতে পারবে।

৩) সরাসরি কোনও রিপোর্ট রেজিস্ট্রি করতে বা এফ আই আর নিতে পারবে না।
৪) সি বি আই ও লোকপাল ভিন্ন থাকবে।
৫) শাস্তি হবে কমপক্ষে ৬ মাস, সর্বাধিক ৭ বছর।
এর পাল্টা 'আন্না হাজারে টিম' যে 'জনলোকপাল'-এর খসড়া সরকারের কাছে পাঠিয়েছে, তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি
১) জনলোকপাল স্বতঃপ্রণোদিত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী।
২) জনলোকপাল নিজেই শাস্তি দিতে পারবে।
৩) এফ আই আর এবং জে এল নিতে পারবে।
৪) জনলোকপাল এবং সি বি আই একই ছাতার তলায় থাকবে।
৫) দুর্নীতির শাস্তি কমপক্ষে ৫ বছর, সর্বাধিক যাবজ্জীবন।
এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, এক বছরের মধ্যে তদন্ত শেষ করে দু'বছরের মধ্যে শাস্তি দেওয়া, প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই
আন্না হাজারের দাবিগুলির কয়েকটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মেনে নিয়েছে, কয়েকটি মানেনি। যে দাবিগুলি মানা হয়নি, তার কয়েকটি

১) প্রধানমন্ত্রীকে লোকপালের আওতায় আনা।
২) সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্টের বিচারপতিদের লোকপালের আওতায় আনা।
৩) সংসদে সাংসদদের আচরণকে লোকপালের আওতায় আনা।
৪) নিচু তলার আমলাদেরও লোকপালের আওতায় আনা।
৫) সিলেকশন প্যানেলে কোনও রাজনীতিককে না রাখা।
৬) ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা রাখা।
৭) সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন এবং সি বি আই-এর দুর্নীতিদমন শাখাকে লোকপালের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া।
৮) লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত বিষয়ে একটি বিল আনা।
৯) অভিযুক্ত পদাধিকারীকে পত্রপাঠ বিদায় করা।

আন্য দিকে, হাজারের যে দাবিগুলি কেন্দ্র মেনেছে
১) লোকপাল চরিত্রগত ভাবে নিছক পরামর্শদাতা সংস্থা হবে না।
২) বিচারের জন্য কোনও সরকারি অনুমতির

প্রয়োজন হবে না।
৩) লোকপালের নিজস্ব তদন্তকারী দল এবং বিচারবিভাগ থাকবে।
৪) কেবলমাত্র বিচারবিভাগ থেকেই লোকপালের সদস্য গ্রহণ করা হবে না।
৫) তদন্ত এবং বিচারের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে।
৬) দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ অধিগ্রহণ করে নেওয়া হবে।
৭) লোকপালে রাজনৈতিক নেতাদের বা ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্য থাকবে না।
প্রথম সূচনা হয় সুইডেনে। সরকারি কর্মচারীদের প্রশাসনিক অন্যায়, অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য ১৮০৯ সালে সুইডেনের সংবিধানে ‘অম্বুডসম্যান’ পদ সৃষ্টি করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নাগরিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং সরকারি দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। অম্বুডসম্যানের অর্থ হল লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা বৈধ প্রতিনিধি। তার পর ব্রিটেন সুইডেনকে অনুসরণ করে। অবশ্য ব্রিটেনের আগেই ফিনল্যান্ড অম্বুডসম্যান পদ তৈরি করে। একে একে অনেক দেশ, যেমন ডেনমার্ক (১৯৫৫), নরওয়ে (১৯৬২),

নিউজিল্যান্ড (১৯৬৩) প্রভৃতি দেশ সুইডিশ পদ্ধতি গ্রহণ করে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার সমাজতান্ত্রিক বন্ধু রাষ্ট্রগুলিও নাগরিক অভিযোগের প্রতিকার ও সরকারি মন্ত্রী, আমলাদের দুর্নীতি বন্ধের জন্য 'অফিস অব দ্য প্রকিয়োরেটর' চালু করে।
২০১৩ সালের আইনানুসারে, লোকপালের এখজন চেয়ারপার্সন থাকবেন এবং থাকবেন অন্য সদস্যরা, যে সদস্য সংখ্যা ৮-এর বেশি হবে না। এঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশকে হতে হবে বিচারবিভাগের সদস্য। চেয়ারপার্সন এবং বাকি সদস্যদের বাছাই করা হবে একই পদ্ধতিতে। একটি সার্চ কমিটি সম্ভাব্য সদস্যদের নামের প্যানেল তৈরি করবে, সিলেকশন কমিটি সেই প্যানেলের নাম প্রস্তাব করবে, রাষ্ট্রপতি তাঁদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করবেন।

আইনে বলা আছে, লোকপালের সদস্যদের অনধিক পঞ্চাশ শতাংশকে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু এবং মহিলা হতে হবে। সার্চ কমিটির সদস্যদের ক্ষেত্রেও

একই নিয়ম লাগু হবে। বেতন, ভাতা এবং চাকরির শর্তাদি লোকপাল চেয়ারপার্সনের ক্ষেত্রে হবে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সমতুল, অন্য সদস্যদের ক্ষেত্রে তা হবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সমতুল।

লোকপাল বিভিন্ন বিভাগ গঠন করবে। এর একটি তদন্ত বিভাগ থাকবে, যারা মাথায় থাকবেন তদন্ত পরিচালক। কোনও সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে অভিযোগ এলে, সে বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত করবে ওই কমিটি। ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য থাকবে একটি প্রসিকিউশন উইং, যার মাথায় থাকবেন ডিরেক্টর অফ প্রসিকিউশন। কোনও সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে লোকপাল যদি কোনও অভিযোগ এনে থাকেন, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দিকটি দেখবে এই বিভাগ। লোকপালের অন্য সদস্যের নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেলে সচিব, ডিরেক্টর অফ ইনকোয়ারি, ডিরেক্টর অফ প্রসিকিউশন এবং লোকপালের অন্য আধিকারিক ও কর্মীনিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এই সরকারি কর্মীদের তালিকা বাস্তবিকই বিস্তৃত। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সাংসদ থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের এ, বি, সি ও ডি পর্যায়ভুক্ত কর্মীদের জন্য নানা আইন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি কোনও অভিযোগ দায়ের হয়, আইনানুসারে লোকপাল তার বিবিধ তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে কিছু শর্ত রয়েছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লোকপাল প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করতে পারবেন না। এই ক্ষেত্রগুলি হল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইনশৃঙ্খলা, আভ্যন্তরীণ ও বহির্নিরাপত্তা, পরমাণুশক্তি বিষয়ক। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ততক্ষণ পর্যন্ত তদন্ত করা যাবে না যতক্ষণ না লোকপালের সব সদস্যরা তদন্ত শুরুর পক্ষে সহমত প্রকাশ করেন এবং অন্তত দুই তৃতীয়াংশ তাতে সম্মতি দেন। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত (যদি হয়) তাহলে তা গোপনে হতে হবে এবং যদি লোকপাল মনে করে অভিযুক্তের পদ খারিজ করা উচিত, তাহলে তদন্তের নথি প্রকাশ করা যাবে না বা সে নথি

কাউকে দেওয়া যাবে না
সরকারি কর্মী হিসেবে এই আইনের আওতাভুক্ত হবেন লোকপালের নিজস্ব সদস্যরাও। চেয়ারপার্সন, সদস্য, আধিকারিক এবং লোকপালের অন্য কর্মীরাও এর আওতাভুক্ত হবেন, দেশে এবং বিদেশে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরাও এর আওতায় থাকবেন। এতে বলা হয়েছে, “এই আইন কোনও একজন কর্মী কেবলমাত্র তাঁর কাজের সময়কালের মধ্যেই এই আইনের আওতায় পড়বেন।“
লোকপাল কোনও সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর প্রাথমিক তদন্ত করতে পারে। সে তদন্ত ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। আবার কোনও তদন্ত সংস্থাকে দিয়েও তদন্ত করানো যেতে পারে। প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরে, লোকপাল কোনও সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে বা বিভাগীয় তদন্ত করাতে পারে। আবার অন্যকোনও যথাযথ সংস্থাকে দিয়েও তদন্ত চালাতে পারে। আবার এই গোটা কর্মপ্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘোষণাও করতে পারে

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য লোকপালের ফুলবেঞ্চের শুনানি করতে হবে এবং তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের অনুমতি লাগবে। শুনানি হবে 'ইন-ক্যামরা'য়।

০ চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণির বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে লোকপাল সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের কাছে তদন্তের জন্য পাঠাবে। সমিতি এবং ট্রাস্টের বিরুদ্ধেও তদন্ত করা যাবে।

বিশেষ করে যারা বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য পান। অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে বিশেষ আদালতে মামলা দাখিল করা যাবে। প্রয়োজনে দুনীতিগ্রস্থ ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও থাকছে।

০ একশো জন সাংসদ প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির কাছে লোকপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারেন। লোকপালেন কাছে প্রত্যেক পাবলিক সার্ভেন্ট সম্পত্তির বিবরণ দেবেন। অসত্য অভিযোগ দায়ের করলে সর্বোচ্চ এক বছর জেল এবং এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

লোকপাল প্রতি বছরে রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক রিপোর্ট দেবে।